হিন্দু সংহতি

স্বদেশ
সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 3, Issue No. 8, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, March 2014

হিন্দু-মুসলিম সমস্যা বিষয়ে, মুসলিমদেরকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য ভারতের প্রাচীন গৌরবগাথা এবং তার আধ্যাত্মিকতাকে জঞ্জালের বাক্সে নিক্ষেপ করার কোন যুক্তি আমি খুঁজে পাই না। মুসলিমরা এই পদ্ধতিতে কোনদিনই মানবে না।

—ঋষি অরবিন্দ, ১-৮-১৯২৬

হিন্দু সংহতির ডাকে কলকাতায় বিশাল হিন্দুসভা

হিন্দু সংহতি-র ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন ভোলাগিরি আশ্রমের সন্ন্যাসী স্বামী তেজসানন্দজী মহারাজ এবং মঞ্চে উপবিষ্ট সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

সাড়ম্বরে পালিত হল হিন্দু সংহতির ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। প্রতি বছর ১৪ই ফেব্রুয়ারী প্রকাশ্য সম্মেলন করে সংহতি তার বর্ষযাপন উৎসব পালন করে থাকে। গত বছর কলকাতায় রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করে হিন্দু সংহতি। কিন্তু এ বছর কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীর সংখ্যা আরও অনেক বেশি হবে আগাম খবর থাকায় সংহতির রাজ্য কর্তৃপক্ষ কলকাতায় ধর্মতলার রানি রাসমণি রোডে প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের সংকল্প নেয়।

কিন্তু গত দু বছরের মতো এ বছরও হিন্দু সংহতিকে প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করতে অনেক অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয়। অনেক আগে থেকে রাজ্য প্রশাসনের কাছে অনুমতির আবেদন করেও কোন লাভ হয়নি। আবেদনপত্রে স্ট্যাম্প মেরে রিসিভ করলেও তাকে কার্যকর করার কোন সদিচ্ছাই প্রশাসন দেখায়নি। শেষ পর্যন্ত হাইকোর্ট থেকে হিন্দু সংহতিকে মিটিং করার অনুমতি আনতে হয়। কিন্তু এরপরেও সভাকে বানচাল করার জন্য প্রশাসন উঠে পড়ে লেগেছিল। শেষ মুহূর্তে ইস্টার্ণ কমান্ডের এন.ও.সি. নিয়ে আসতে বলা হয়। আর্মি সহজেই হিন্দু সংহতিকে সেই এন.ও.সি. দেয়। এই রানি রাসমণি রোডে বেশ কয়েকটি সংখ্যালঘু সংগঠন তাদের মিটিং করে প্রশাসনের বিনা অনুমতিতেই। প্রশাসন এদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার সাহস দেখাতে পারেনি। অথচ হিন্দু সংহতির কণ্ঠরোধ করার জন্য তাদের তৎপরতা ছিল দেখার মতো। শেষ পর্যন্ত হিন্দু সংহতি সমস্তরকম অনুমতিপত্র হাতে নিয়েই তাদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সভা করে।

প্রতি বছরের মত এবারও মহা সমারোহে পালিত হল হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এই ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ৩০ হাজারেরও বেশি সংহতির সভ্য, সমর্থক তথা হিন্দুত্বপ্রেমী নাগরিক একত্রিত হলেন কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলায়। ধর্মতলার রাণী রাসমণি এভিনিউতে তিলধারণেরও জায়গা ছিল না। রাজ্য প্রশাসনের সমস্ত বাধা এবং সাথে সাথে সন্দেশখালির সাজাহান শেখদের মত গুণ্ডাদের হুমকি সত্ত্বেও হাজার হাজার মানুষের যোগদান এই সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করেছে এবং বাংলার হিন্দুত্ববাদী আন্দোলনকে এক নতুন মাত্রা দিল। সারা বাংলা থেকে আগত সংহতির কর্মী তথা সমর্থকদের উদ্দীপনা ছিল দেখার মত। সভার শুরুতে দেশাত্মবোধক গান এবং আদিবাসী নৃত্য পরিবেশন করা হয়। অতিথিদের বরণ করার পরে সংহতির অন্যতম কর্মী অজিত অধিকারী তার ভাষণে সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসকারী হিন্দুদের উপর বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানপন্থী মুসলমানদের অত্যাচারের কথা তুলে ধরেন।

তিনি বলেন সেখানে হিন্দুর সামনে দুটি মাত্র পথ খোলা আছে—হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গম, জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্। অর্থাৎ হয় লড়াই করে মরতে হবে নতুবা লড়াইয়ে জিতে মাথা তুলে রাজত্ব করতে হবে। হরিদ্বার ভোলাগিরি আশ্রমের সন্ন্যাসী স্বামী তেজসানন্দজী তাঁর ভাষণে উপস্থিত জনতাকে ধর্মের পথে চলতে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন বাংলার অত্যাচারিত হিন্দুদের এখন প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং প্রয়োজন হলে প্রতিশোধ নেওয়ার সাহস অবলম্বন করে উঠে দাঁড়াতে হবে। ভারতরক্ষা মঞ্চের সর্বভারতীয় আহ্বায়ক সূর্যকান্ত কেলকার বলেন এদেশে হিন্দুত্ব এবং ভারতীয়ত্ব শব্দ দুটি সমার্থক। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে ভারত হিন্দুরাষ্ট্র। সেক্যুলারবাদীদের সতর্ক করে তিনি বলেন এদেশে ভোটের লোভে সেক্যুলারিজমের নামে দেশবিরোধীদের প্রশ্রয় দেওয়ার যে রীতি প্রচলিত হয়েছে, তার বিরুদ্ধে প্রত্যেক দেশভক্ত হিন্দুকে রুখে দাঁড়াতে হবে।

হিন্দু সংহতির সহ-সভাপতি শ্রী বিকর্ণ নস্কর তাঁর ভাষণে সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষপাতমূলক আচরণের সমালোচনা করে বলেন যে, যেভাবে ভোটের লোভে মুসলমানদের সমস্ত অন্যায় এমনকি দেশবিরোধী কার্যকলাপকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে এবং পাশাপাশি হিন্দুকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে, ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, তাতে এরাজ্যে হিন্দুর অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছে। সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী ইত্যাদি তকমা দিয়ে হিন্দুকে তার হকের লড়াই থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন দেশরক্ষার জন্য, পায়ের তলার মাটি রক্ষার জন্য সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী নামে অভিহিত হতে হয়, তাহলে তার জন্য লজ্জা নয়, বরং গর্ব অনুভব করা উচিত।

সভার প্রধান অতিথি, সুদর্শন টি.ভি.-র কর্ণধার শ্রী সুরেশ খান্ডেকার চত্বানকে সংহতির কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে, তিনি বাংলার রয়েল বেঙ্গল টাইগারদের গর্জন শুনতে কলকাতায় এসেছেন। এই তিরিশ হাজার যুবকদের মধ্যে তিনি ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের সেনাবাহিনীর ছবি দেখতে পাচ্ছেন। সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষের কর্মধারার সাথে তিনি নেতাজি সুভাষ বোসের কর্মধারার তুলনা করেন। তিনি বাংলার এই হিন্দু আন্দোলনকে তাঁর 'সুদর্শন' চ্যানেলের মাধ্যমে যথাসাধ্য সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি সভামঞ্চ থেকে করেন।

সবশেষে বক্তব্য রাখেন সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ। তিনি তাঁর বক্তব্যে রাজ্য পুলিশের এক অংশের সমালোচনা করে বলেন পুলিশ দুর্নীতিগ্রস্থ এবং সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক প্রভাবাধীন। এর পরিণাম স্বরূপ বাংলাদেশপন্থী মুসলমানদের আক্রমণ থেকে হিন্দুকে বাঁচানোর সদিচ্ছা অথবা ক্ষমতা কোনটাই তাদের নেই। তিনি বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে বলেন যে, যেখানে পুলিশ নিজের নিরাপত্তাই নিশ্চিত করতে পারে না, সেখানে তারা হিন্দুদের নিরাপত্তা কিভাবে দেবে? তাই হিন্দুর সুরক্ষার দায়িত্ব তাকে নিজেকেই পালন করতে হবে। দিকে দিকে হিন্দুদের অরাজনৈতিক ধর্মীয় এবং সামাজিক ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। যুবকদের হিন্দুর সুরক্ষার স্বার্থে আত্মবলিদান দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

আমাদের কথা

সংবাদ মাধ্যমের অপচেষ্টা

১৪ই ফেব্রুয়ারী হিন্দু সংহতির রানি রাসমনি রোডে প্রকাশ্য সমাবেশে সংবাদপত্রগুলি ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ভূমিকা ছিল আশ্চর্যজনক। এদেশের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকদের (হিন্দুদের) দাবি নিয়ে সোচ্চার একটি সভা-র বিষয় এদেশের সেক্যুলার মিডিয়ার মাথাব্যথার কারণ হবে না, এটা জানা কথা। কিন্তু তাদের বিরোধমূলক আচরণ অবাক করার মতোই ঘটনা। এ রাজ্যের প্রথম শ্রেণীর দৈনিক বাংলা পত্রিকাগুলো হিন্দু সংহতির (সংগঠনের নাম পর্যন্ত লেখেনি) মিটিং-মিছিলে সাধারণ মানুষের হয়রানির কথা লিখতেই ব্যস্ত। তীব্র যানজটের ফলে নিত্যযাত্রীদের কী ভোগান্তি তা ফলাও করে তারা লিখলো। কিন্তু বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সামাজিক পরিস্থিতিতে এ কতটা প্রাসঙ্গিক ছিল তা বলার প্রয়োজন মনে করলো না কেউ। অথচ তার দুসপ্তাহ পূর্ববর্তী সময়ে তিন-তিনটে ব্রিগেড মিটিং হল। মিছিলে মিছিলে পুরো কলকাতা স্তব্ধ হয়ে গেল। দিনভর যানজটে মানুষকে নাকাল হতে হল। অথচ তাই নিয়ে ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও সংবাদপত্রগুলোর উৎসাহ ছিল দেখার মতো। আসলে তেলা মাথায় তেল দিতে সকলেই পছন্দ করে। আর এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের মিডিয়ার জুড়ি মেলা ভার। আসলে এ বলে আমায় দাও, ও বলে আমায়।

সম্প্রতি পশ্চিমবাংলায় পুনর্জন্ম হওয়া একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকা তো হিন্দু সংহতির মিটিংকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক বলে উল্লেখ করেছে। পশ্চিমবঙ্গে সিমি-র জন্মদাতা এই পত্রিকার সম্পাদক এবং আজও তিনি গোয়েন্দা সংস্থার নজরে আছেন। অথচ কোন এক বাধ্যবাধকতায় মমতা ব্যানার্জী এনাকে রাজ্যসভায় মনোনীত করে পাঠিয়েছেন। এই পত্রিকার কাজই হল পশ্চিমবাংলায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়িয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করা তারাই এ ধরণের খবর ছাপিয়ে নিজেদেরকে ধর্মনিরপেক্ষতার বরপুত্র বলে প্রতিপন্ন করতে চাইছে। এ যেন চোরের মায়ের বড় গলা। ধর্মনিরপেক্ষতা এদের একটা ছদ্মবেশমাত্র। তলে তলে জেহাদি শক্তিকে শক্ত করাই এদের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে তারা কোন খবরের সত্যতা গোপন করতে বা মূল ঘটনাকে বিকৃত করে ছাপতেও পিছপা হয় না। ক্যানিং-এর নলিয়াখালিতে দুশো হিন্দুর ঘর পুড়ল। দুষ্কৃতিদের দ্বারা খুন হওয়া এক ব্যক্তির আক্রোশ পড়ল দুটো গ্রামের উপর। খুন হওয়া ব্যক্তির গতিবিধিও ছিল সন্দেহজনক। কিন্তু পত্রিকাটিতে সম্পূর্ণ বিকৃত খবর ছেপে জনগণের কাছে প্রকৃত সত্যকে গোপন করা হল। এরকম অনেক খবরের ক্ষেত্রেই তারা সত্যকে গোপন করে মনগড়া কাহিনি নিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে। দু-একটা খুন-জখম বা ধর্ষণের ঘটনায় দুষ্কৃতির নাম প্রকাশ করে তারা সাধারণের চোখে ধূলো দিতে চায়। নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী বলে প্রচার করে। এ তাদের 'টাকিয়া' পদ্ধতি। এদের ব্যাপারে এখনই সচেতন না হলে আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গের সম্প্রীতি যে বিঘ্নিত হবে, তা বলাবাহুল্য।

অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার জয়নগরে

দঃ ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর থানার বেলে দুর্গানগর গ্রামে মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার হল দু'জন সমাজবিরোধী। গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী জয়নগর থানার পুলিশ বেলে দুর্গানগর গ্রাম থেকে জাকির হুসেন শেখ এবং আলী হুসেন শেখ নামের দুই দুষ্কৃতিকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার করে। সীমান্তবর্তী এই জেলায় একটি বিশেষ জনগোষ্ঠী পরিকল্পনা মাফিক অস্ত্রশস্ত্র মজুত করছে। বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে তাড়া খেয়ে বহু সন্ত্রাসবাদী সীমান্ত পেরিয়ে এই রাজ্যে প্রবেশ করেছে এবং তারা এখানে স্থানীয়ভাবে আশ্রয় পাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে পুলিশের এই সাফল্য তাৎপর্যপূর্ণ।

লাভ জেহাদের শিকার কণিকা

উদ্ধার হলো সংহতি কর্মীদের তৎপরতায়

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী বিকাল ৪-৩০ মি. নাগাদ স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে ১৪ বছর বয়সী নাবালিকা কণিকা মন্ডলকে জোর করে অপহরণ করে করিবুল্লা মোল্লা। দঃ ২৪ পরগণা জেলার বাসন্তী থানার ৮নং তিতকুমার গ্রামের স্বপন মন্ডলের নাবালিকা কন্যা কণিকা স্কুল ছুটির পর যখন বাড়ি ফিরছিল, তখন ৭নং ঢুঁড়ি গ্রামের ভোলা মোল্লার ছেলে করিবুল্লা তাকে জোর করে তুলে নিয়ে যায়। পুলিশে খবর দিলে খোঁজখবর শুরু হয়। অবশেষে হিন্দু সংহতির কর্মীদের সহায়তায় পুলিশ পরের দিন কণিকাকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়। মুসলিম অধ্যুষিত দঃ ২৪ পরগণা জেলায় এই লাভ জেহাদের ঘটনা নতুন কিছু নয়, তবে হিন্দু সংহতির কর্মীদের সক্রিয়তায় ঘটনাগুলি জনসমক্ষে প্রকাশিত হচ্ছে এবং কিছু ক্ষেত্রে হিন্দু মেয়েদের উদ্ধারও করা যাচ্ছে।

মিঞাল্যান্ডের দাবিতে সমাবেশ আলমগঞ্জে

পৃথক কামতাপুর, বড়োল্যান্ড, কার্বিল্যান্ডের দাবিতে যখন উত্তাল আসাম তখন মিঞাল্যান্ডের দাবিও উঠলো। রবিবার ধুবড়ি জেলার গৌরীপুর এলাকার আলমগঞ্জে এক গণসমাবেশে মিঞাল্যান্ডের দাবি তোলে অসম মিঞা পরিষদ। সংগঠনের আলমগঞ্জ কমিটির ওই সমাবেশে মিঞাল্যান্ডের দাবিতে সরব হন পরিষদের সভাপতি এম জি হাজারিকা, মিঞা যুব পরিষদের সভাপতি রফিকুল আলম, নেত্রী ইমিলা বেগম প্রমুখ। এছাড়া, বিটিএডি চুক্তি পুনরায় খতিয়ে দেখে এই এলাকা থেকে অ-বড়ো গ্রাম কর্তনের পাশাপাশি গ্রাম প্রধানের সহযোগিতায় এ— আর সি তৈরি ও ডি. ভোটার তথা বিদেশী নাগরিক সমস্যার স্থায়ী সমাধানের পক্ষেও সওয়াল করা হয়। সমাবেশে ভাষণে হাজরিকা বললেন, মিঞাদের দাবিদাওয়া নিয়ে সরকার বরাবরই উদাসীন। এই মানুষগুলির সাংবিধানিক অধিকার ও রক্ষাকবচ সুরক্ষিত করতে মিঞা স্বশাসিত পরিষদের দাবি তোলেন তিনি। এ দিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন আবু সাহেদ মহম্মদ সাদুল্লা। (যুগশঙ্খ, ১৭ই ফেব্রুয়ারী)

দুষ্কৃতির আক্রমণে আহত হিন্দু সংহতির কর্মী

পুলিশ দুষ্কৃতির বদলে থানায় পুরলো আক্রান্তদের

উত্তর ২৪ পরগণার সন্দেশখালী থানার সরবেড়িয়া অঞ্চলে দুষ্কৃতি দ্বারা আক্রান্ত হল হিন্দু সংহতি কর্মী। তাদের প্রচণ্ডভাবে মারধোর করা হয়। দারুণভাবে আহত অময় ভুঁইয়া ও রমেন মুকলিয়াকে বসিরহাট হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় ১লা ফেব্রুয়ারী সকাল দশটার সময় অময়, পরেশ, রমেন সহ বেশ কয়েকজন হিন্দু সংহতি কর্মী ১৪ ফেব্রুয়ারীর প্রতিষ্ঠা দিবসের পোস্টার লাগাচ্ছিল সরবেড়িয়া বাজারে। সেই সময় সাজাহান সেখ সহ বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতি তাদের বিনা প্ররোচনায় মারধোর করতে থাকে। হিন্দু সংহতির নামে গালিগালাজ করতে করতে সাহাজান বলে—তোদের হিন্দু সংহতি করা বের করে দেব। উত্তর ২৪ পরগণার পুলিশ আমার পকেটে। তোদের নামে ফলস কেস দিয়ে সারাজীবনের মতো জেলে ভরে দেব। দুষ্কৃতিদের হাতে পিস্তল, কাটারি, ছুরি, লোহার রড, লাঠি ছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল অময়, পরেশ ও রমেন। দুষ্কৃতিরা রড দিয়ে পরেশের মাথায় আঘাত করলে তার মাথা ফেটে যায়। তাতে সাতটি সেলাই পড়েছে। অময় হাতে-পায়ে, বুকে ও পিঠে এবং রমেন হাতপায়ে ও মুখে প্রচণ্ড আঘাত পায়। এরপর অময়, রমেন ও পরেশকে দুষ্কৃতিরা সরবেড়িয়া নতুনবাজারে টি.এম.সি পার্টি অফিসে নিয়ে আটকে রাখে ও মারধোর করে।

খবর পেয়ে এদের বাড়ির লোকেরা সন্দেশখালি থানায় ফোন করলে পুলিশ ও র‍্যাফ এসে তাদের উদ্ধার করে। এই সময়ে দুষ্কৃতিদের একজন ফজলু নাইয়া পুলিশের সামনে অময়ের পকেটে একটি ম্যাগাজিনসহ পিস্তল গুঁজে দেয় ও ফটোগ্রাফার ডেকে ফটো তোলায়। এরপর এদেরকেই দোষী সাব্যস্ত করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। গুরুতর আহত অময় ও রমেনের চিকিৎসায় পুলিশের গাফিলতিতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। নিকটবর্তী হাসপাতালে না নিয়ে দুটো নদী পেরিয়ে প্রত্যন্ত দ্বীপ খুলনা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। সেখান থেকে আবার এদের বসিরহাট হাসপাতালে রেফার করে পাঠানো হয়। বর্তমানে অময় ও রমেন পুলিশ হেফাজতে বসিরহাট হাসপাতলে চিকিৎসাধীন আছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, সরবেড়িয়া নতুনবাজার সাজাহান সেখ ও তার দুষ্কৃতি দলের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। কিছুদিন আগেও সাজাহান সি.পি.এম. পার্টির ছত্রছায়ায় ছিল। কিন্তু রাজ্য জুড়ে পরিবর্তনের হাওয়ায় ও সরকার বদলে সাজাহানও দল বদল করে শাসকশ্রেণীর ছত্রছায়ায় এসে গেছে। তার দলের ছেলেরা গুণ্ডামি, তোলাবাজি প্রভৃতি অসামাজিক কাজের সঙ্গে জড়িত। এদের দাপটে এলাকার সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ। কিন্তু ভয়ে কেউ প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চায় না।

এই প্রতিবেদন লেখার সময়ে অময় ও রমেন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে। কিন্তু পুলিশ তাদের ও পরেশ মন্ডলকে গ্রেপ্তার করে। কোর্টে তুললে তাদের জেল হাজত হয়ে যায়। পুলিশ-দুষ্কৃতি যোগসাজশে আইন বোকা বনে গিয়েছে। যে দুষ্কৃতিরা অময়দের অমানুষিকভাবে মারধোর করলো, তারা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর যারা দারুণভাবে আহত হল তাদের সুস্থ হতে না হতেই জেলে যেতে হল।

অরাজকতার রাজ্যে দুষ্কৃতির তাণ্ডব

রেহাই মিলল না সরকারি মহিলাকর্মীরও

হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত টাকী পুরসভার ১২ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা শ্রীমতি অনিতা মজুমদার (স্বামী রবীন মজুমদার)। তিনি একজন অঙ্কনওয়াড়ি কর্মী। কর্মসূত্রে তাকে হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত পটনি খানপুর অঞ্চলের পূর্ব মহিষপুকুর মুসলিম পাড়ায় যেতে হয়। ১৬ই জানুয়ারি অঞ্চলে মাদারস্ মিটিং ডাকা হলে সেখানে অনেক মা-ই অনুপস্থিত ছিলেন। সেই কারণে ১৯শে জানুয়ারী পালস্ পোলিওর দিন আবার মাদারস্ মিটিং ডাকা হয়। বেশিরভাগ মা-রা উপস্থিত থাকলেও কয়েকজন সেদিনও অনুপস্থিত ছিল। তারমধ্যে সারামিন সুলতানা নামের একটি বাচ্চার মা এদিন আসেন নি। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের কথায় তিনি কখনও মিটিং-এ আসেন না। এদিনও নিজে না এসে মেয়েকে দেবর সামসুর জামানকে দিয়ে পোলিও খাওয়াতে পাঠায়। অনিতাদেবী মেয়েকে আসেনি কেন জিজ্ঞাসা করায় সামসুর জামান অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে শুরু করে ও মারতে তেড়ে আসে। সেইসময় অন্যান্য কর্মীদের মধ্যস্থতায় তখনকার মতো ব্যাপারটা মিটে যায়।

এরপর ৩১শে জানুয়ারী সারমিন সুলতানাকে আবার তার বাড়ির লোক অন্য একজনকে দিয়ে সরকারি কেন্দ্রে খাবার আনতে পাঠায়। এতবার বলা সত্ত্বেও সারমিনের মা না আসায় অনিতাদেবী তার প্রতিবাদ করে এবং সারমিনকে তার মাকে আনতে বলে। তখন লোকটি সারমিনকে নিয়ে চলে যায়। কাজ শেষের পর অনিতাদেবী যখন সেন্টার বন্ধ করে কিছুদূর এসেছেন তখন সামসুর জামান সরদার (পিতা ইউনুস সরদার) তার উপর চড়াও হয়। গালিগালাজ করতে করতে সে অনিতাদেবীকে ধাক্কা দেয়। অনিতাদেবী আত্মরক্ষার জন্য সেখান থেকে পালাতে গেলে সামসুর তার কাপড়ের আঁচল

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অনিতা মজুমদার

ধরে টানে ও বুকে পেটে লাথি ঘুষি মারে। গালে চড় মারে ও তার ব্যাগটি ছিনিয়ে নেয়। এরপর সামসুরের মা-ও এসে অনিতাদেবীকে চুলের মুঠি ধরে মারে। চিৎকার চেঁচামেচিতে বেশ কিছু লোক জড়ো হয়ে যায়। তারাই অনিতাদেবীকে দুষ্কৃতিদের হাত থেকে রক্ষা। সামসুর যাওয়ার সময় অনিতাদেবীকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয়।

এরপর, কিছু লোক তাকে গাড়িতে তুলে দেয়। বাড়ি এসে অসুস্থ বোধ করায় অনিতাদেবীকে টাকী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। একদিন ভর্তি থাকার পর ১লা ফেব্রুয়ারী তাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। আক্রান্ত হওয়ার সময় অনিতাদেবীর এক কানের সোনার দুল ও ব্যাগ থেকে ৯৫০ টাকা খোয়া যায়।

অনিতাদেবীর এই ঘটনা বিগত শতকের শেষের দিকে বানতলায় সরকারি মহিলাকর্মী আক্রান্ত হওয়ার ঘটনাকে মনে করিয়ে দেয়। অনিতাদেবীর ভাগ্য ভালো যে আরও চরম অপমানের হাত থেকে তিনি রক্ষা পেয়েছেন। কিন্তু মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে কাজ কার হিন্দু মহিলারা কতখানি অসুরক্ষিত তা অনিতাদেবীর ঘটনা আবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

জাতি ও বর্ণভেদ আর কতদিন ?

ক্ষত্রিয় ও নবক্ষত্রিয়

৩য় পর্ব

তপন কুমার ঘোষ

ক্ষত্রিয় মানে যে ব্যক্তি সমাজকে ক্ষত থেকে রক্ষা করে। কিন্তু এই সংজ্ঞাও পূর্ণ নয়। যে ব্যক্তি সমাজকে বাইরের ক্ষত থেকে রক্ষা করে সে-ই ক্ষত্রিয়। ভিতরের ক্ষত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব ক্ষত্রিয়ের নয়। সে দায়িত্ব সমগ্র সমাজের। বাইরের ক্ষত আসে বাইরের থেকে। অর্থাৎ বাইরের আক্রমণ থেকে। তাই বহিরাক্রমণ থেকে সমাজকে রক্ষা করা হচ্ছে ক্ষত্রিয়ের কাজ বা দায়িত্ব। এই কাজকে অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আমাদের দেশে ও সমাজে। প্রকৃতপক্ষে সব দেশেই দেওয়া হয়। তাই আমাদের দেশে রাজা হতেন ক্ষত্রিয়রা। শুধু ক্ষত্রিয়রা। সেইজন্য ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেকের সময় সমস্যা হয়েছিল। পুণের ব্রাহ্মণরা শিবাজীর রাজ্যাভিষেক করতে অস্বীকার করেছিলেন এই কারণে যে শিবাজীর বংশ ক্ষত্রিয় বংশ নয়। সেই ব্রাহ্মণরা অবশ্যই রূঢ়িবাদী ছিলেন এবং সমসাময়িক পরিস্থিতি সম্বন্ধে চেতনাহীন ছিলেন। ঠিক ঊনবিংশ শতাব্দীতে কাশ্মীরের নির্বোধ ব্রাহ্মণদের মত যারা কাশ্মীরের মুসলমানদেরকে হিন্দু ধর্মে ফিরে আসতে বাধা দিয়ে ভারতের সর্বনাশ করেছিলেন। শিবাজীর ক্ষেত্রে বারাণসী থেকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গাগা ভট্ট এসে তাঁর রাজ্যাভিষেক করেছিলেন, পুণের পণ্ডিতরা করেন নি। যাইহোক এদেশে প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয়রা রাজা হতেন। তাই তাদের আর এক নাম রাজপুত, অর্থাৎ রাজার পুত্র। এই ক্ষত্রিয়ের মধ্যে সূর্যবংশ, চন্দ্রবংশ প্রভৃতি অনেক বংশ ছিল। এরাই রাজা, এবং এই বংশেরই লোকেরা বহিরাক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করতেন। অর্থাৎ যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের কাজ। কিন্তু এই প্রথা সর্বত্র ছিল না। কারণ, বর্ণাশ্রম প্রথা সারা ভারতে সমানভাবে প্রচলিত ছিল না। রাজা জনকের আচরণ ব্রাহ্মণের মত বা ঋষির মত ছিল। তাই তিনি ক্ষত্রিয় রাজা হয়েও রাজর্ষি জনক নামে অভিহিত হতেন। কিষ্কিন্ধার রাজা বালি বা সুগ্রীব ক্ষত্রিয় বংশ ছিলেন কিনা সঠিকভাবে জানা যায় না। সবথেকে বড় উদাহরণ রাবণ। রাবণ তো লঙ্কার রাজা ছিলেন। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। অর্থাৎ রাবণ বর্ণাশ্রম প্রথা না মেনে রাজা হয়ে বসেছিলন। এছাড়া আমাদের অনেক জনজাতির মধ্যেও বর্ণাশ্রম প্রথা চালু ছিল না। তাদের মধ্যেও যোগ্যতা অনুসারে রাজা হতেন। এইসব জনগোষ্ঠীতে বাইরের আক্রমণ রোখার দায়িত্ব কোন নির্দিষ্ট অংশের উপর থাকত না। এই জনগোষ্ঠীর সবাই সেই আক্রমণ প্রতিরোধে বা লড়াইতে অংশগ্রহণ করত। সুতরাং এইসব জনজাতি জনগোষ্ঠীর সকল ব্যক্তিকেই ক্ষত্রিয়ের কাজ করতে হত। তাই এই জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে ক্ষত্রিয়ের গুণ বা বৈশিষ্ট্য পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায়। এছাড়া কাশীর ডোমরাজা, আমাদের হুগলির বাসন্তী বালিয়া রাজ্যের বাগদী রাজা, প্রভৃতি অনেক অ-ক্ষত্রিয় রাজার উদাহরণ আছে।

যাইহোক, ক্ষত্রিয়ের কাজ যুদ্ধ করা, দেশ রক্ষা করা এবং রাজ্য জয় করা। একটা ভুল কথা হিন্দুত্ববাদীরা প্রচার করেন যে হিন্দুরা পররাজ্য আক্রমণ করে না ও জয় করে না। এটা সম্পূর্ণ ভুল। আমাদের ক্ষত্রিয় রাজারা অন্যের রাজ্য আক্রমণ ও জয় করতেন রাজ-চক্রবর্ত্তী উপাধি অর্জনের জন্য। এই আক্রমণের জন্য সবথেকে ভাল দিন হিসাবে গণ্য হত বিজয়া দশমীর দিন। নবমীর দিন শস্ত্রপূজা করে দশমীর দিন বিজয় যাত্রা শুরু। তাই বিজয়া দশমীর তিথিকে ক্ষত্রিয় রাজারা সীমোল্লঙ্ঘন দিবস হিসাবে পালন করতেন। ওইদিন তাঁরা নিজেদের রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করতেন, পররাজ্যের সীমানা উল্লঙ্ঘন করতেন। এ বিষয়ে আরও বিশদভাবে আমি 'বিজয়া দশমী' প্রবন্ধে লিখেছি।

এই রাজ্য জয়, রাজ্য রক্ষা ও যুদ্ধের জন্য ক্ষত্রিয়রা হত অকুতোভয়, সাহসী, শক্তিশালী। সবথেকে বড় কথা—তারা ছিল মৃত্যুভয়হীন। এই যে তারা মৃত্যুকে ভয় করত না—এর পিছনে দুটো কারণ ছিল। (১) তাদের কর্তব্যনিষ্ঠা ছিল প্রবল। কর্তব্য পালনের জন্য প্রাণও তাদের কাছে তুচ্ছ ছিল। (২) আমাদের ধর্মের সর্বোচ্চ মানবিন্দুতে তাদের আস্থা ছিল গভীর। আত্মা অবিনশ্বর, আত্মার মৃত্যু নেই। মানুষ শুধু শরীর নয়, মানুষ আত্মা। মৃত্যু হলে শরীরের মৃত্যু হবে, আমার নয়। তাই তারা মৃত্যুভয়হীন হয়ে যুদ্ধে এগিয়ে যেত। আর এটা তো জানা কথা যে, যে মৃত্যুর পরোয়া না করে যুদ্ধ করবে, যুদ্ধে সেই জিতবে। তাই আমাদের সেনাবাহিনী ছিল বিশ্বে অপরাজেয়। আমাদের বর্ণাশ্রম প্রথা নষ্ট হয়ে যাওয়ার বহুশত বছর পরেও এ পরিচয়, এই প্রমাণ আমরা দিয়েছি। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে যে ভারতীয় সৈন্যরা লড়েছিল, তাদের বীরত্ব কাহিনী আজও যুদ্ধের ইতিহাসে Legend হয়ে আছে। হিটলারের দোর্দণ্ডপ্রতাপ অপরাজেয় সেনাপতি রোমেলকেও যুদ্ধে হারিয়েছিল ভারতীয় বাহিনী।

ক্ষত্রিয়দের বীরত্বের কাহিনী আমাদের দেশের মহাকাব্য, পুরাণ, ইতিহাস, সাহিত্যে ভরপুর। আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা রাজকাহিনী, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা রাজসিংহ প্রভৃতি উপন্যাসেও প্রচুর। তাদের বীরত্ব, পরাক্রম, প্রতিজ্ঞাপালন, দান, দুর্বল ও শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়া, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করা, কোন আহ্বান (Challange) কে প্রত্যাখ্যান না করা, যুদ্ধে পিঠ না দেখানো, নিরস্ত্র শত্রুর উপর অস্ত্রাঘাত না করা—এ সমস্ত ছিল ক্ষত্রিয়ের আচরণের বৈশিষ্ট্য। এর নামই ক্ষাত্রধর্ম।

অনেকবার বলার চেষ্টা করেছি যে আমাদের ঋষিমুনিদের ধারণায় 'ধর্ম' মানে শুধু আধ্যাত্মিকতা, ভগবৎপ্রাপ্তির সজ্ঞান ও সক্রিয় প্রচেষ্টা, পৃথকভাবে ভগবৎভজনা, ভগবৎসাধনা, নাম-সংকীর্তন, পূজাপাঠ, জপধ্যান নয়। সর্বসাধারণের কাছে 'ধর্ম'-এর কী অর্থ হওয়া উচিত—তা বুঝতে হলে সর্বসাধারণের প্রচলিত ভাষায় প্রচলিত—রাজধর্ম, প্রজাধর্ম, পিতৃধর্ম, পুত্রধর্ম, ছাত্রধর্ম, ক্ষাত্রধর্ম, ধর্মকাঁটা, ধরম হাসপাতাল, প্রভৃতি শব্দগুলিকে লক্ষ্য করতে হবে। এই প্রত্যেকটি শব্দ দিয়ে কর্তব্য বা কর্মকে চিহ্নিত করা হয়েছে। কোন পূজাপদ্ধতি জপতপকে নয়।

ক্ষত্রিয় বা ক্ষত্রিয় রাজাদের মধ্যে হরিশচন্দ্র তাঁর প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য শ্মশান ডোমের কাজ করেছেন, রামচন্দ্র ১৪ বছর বনবাস ভোগ করেছেন, পাণ্ডবরা ১৩ বছর বনবাস ও অজ্ঞাতবাস ভোগ করেছেন, যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের পাশাখেলার আহ্বানকে অস্বীকার না করে সর্বস্ব খুইয়েছেন, শিবিরাজা শরণাগত পায়রাকে আশ্রয় দিতে নিজের উরু থেকে মাংস কেটে দিয়েছেন, কর্ণ নিজের প্রাণরক্ষাকারী কবচকুণ্ডল পর্যন্ত দান করে দিয়েছেন, মহারাণা প্রতাপ ১২ বছর জঙ্গলে থেকে ঘাস-বীজের রুটি খেয়ে জীবনধারণ করেছেন। এসবই হল ক্ষত্রিয়ের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করাই হল ক্ষাত্রধর্ম পালন।

কিন্তু এই ক্ষত্রিয়দের পথনির্দেশ করতেন ব্রাহ্মণরা ও ঋষিরা। ক্ষত্রিয় রাজা। তাঁরা রাজ্য চালাতেন। কিন্তু রাজ্য চালানোর নিয়ম ও নীতিগুলি তৈরি করে দিতেন ব্রাহ্মণরা ও ঋষিরা। তাঁদের তৈরি করা নিয়ম পালন করে রাজারা রাজ্য চালাতেন। তাই বাহুবল ও অস্ত্রশক্তিতে ক্ষত্রিয়রা বলীয়ান হলেও তাদেরকে ব্রাহ্মণদের নিয়ন্ত্রণে থাকতে হত। শক্তিশালী ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবেই অত্যাচারীতে পরিণত হয়। এবং বহুবার তা-ই হয়েছে। বলীরাজা অত্যাচারী হয়ে পৃথিবীকে কষ্ট দিয়েছেন। ভগবান বিষ্ণু বামন অবতাররূপে এসে বলীরাজাকে দমন করে পৃথিবীকে কষ্টমুক্ত করেছেন। দেবরাজ নহুষ অত্যাচারী হয়েছিলেন। তাঁর উপর ঋষিদের অভিশাপ পড়েছিল। ক্ষত্রিয়রা বহুবার নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে অত্যাচারীতে পরিণত হয়েছিল। তাই পরশুরাম ২১ বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। কেবল ক্ষত্রিয় রমণীদের গর্ভস্থ সন্তানদের দ্বারা ক্ষত্রিয়জাতির বংশরক্ষা হয়েছিল। যে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি শক্তিশালী হয় অথচ নিয়ন্ত্রণহীন হয়, তাহলে তাদের অত্যাচারী হওয়ার প্রবণতা খুবই স্বাভাবিক। সেইজন্যই ক্ষত্রিয়দেরকে ব্রাহ্মণদের নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছিল। এমন কি রাজার রাজ্যাভিষেকের সময় কুলপুরোহিত/কুলগুরু রাজার মাথায় স্বর্ণদণ্ড ছুঁইয়ে বলতেন 'ধর্মদণ্ডোহ্সি'। অর্থাৎ রাজাকে ধর্মদণ্ডের অধীন থাকতে হবে, বা রাজা ধর্মের বিপরীত আচরণ করলে তাঁকে দণ্ড পেতে হবে। এই নীতিটি বহুলাংশে পালন করার ফলেই ভারতবর্ষের রাজারা বিশ্বের সমস্ত দেশের রাজাদের থেকে অনেক বেশি জনকল্যাণকারী ছিলেন।

গুণ ও কর্ম অনুসারে সমাজের বর্গীকরণের ফলে অনেক দিক থেকে লাভ হয়েছিল। দু'টি লাভ তো সহজেই বোঝা যায়—কম যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরও জীবিকার নিরাপত্তা (ইউরোপীয় নীতি "Survival of the fittest"-এর বিপরীত) এবং বিভিন্ন বৃত্তীয় পেশায় চূড়ান্ত পারদর্শিতা। উদাহরণ ঃ- ঢাকার মসলিন, মুঙ্গেরের তরবারী ইত্যাদি। কিন্তু সমাজের এই বর্গীকরণ এবং তার প্রতি Rigid থাকা—এর ফলে ভারতের একটি বিশাল ক্ষতি হয়েছে যা অপূরণীয়। ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধ করবে। অন্যরা অন্য কাজ করবে, অর্থাৎ যুদ্ধ করবে না। তাই ভারতের পশ্চিম থেকে আগত নৃশংস পাশবিক শক্তির আক্রমণ আমাদের ক্ষত্রিয় রাজারা ও তাদের ক্ষত্রিয় সেনাবাহিনী অনেকদিন রুখেছিল। কিন্তু যখন আর পারল না, ক্ষত্রিয় সেনা নিঃশেষ হয়ে গেল—তখন সমাজের অন্য শ্রেণীর মানুষ যুদ্ধ করতে এগিয়ে এল না। কারণ শুধু ক্ষত্রিয়র কাজ তো যুদ্ধ করা, অন্যদের তো নয়। অথচ হিন্দুসমাজের বিশাল শূদ্র সমাজ, যারা ছিল শারীরিক শক্তিতে ভরপুর ও ধর্মনিষ্ঠ, তাদেরকে খুব সহজেই প্রশিক্ষণ দিয়ে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা যেত। তার ফলে সৈন্যবাহিনীর ক্ষয়পূরণ করা যেত। কিন্তু এই বর্গীকরণ অথবা জন্মভিত্তিক কর্মনির্ধারণের ফলে তা করা যায় নি। এর ফলেই আমরা হাজার বছরের পরাধীনতা ভোগ করলাম। এখনও করছি। আমরা এখনও পরাধীন।

এইখানেই ব্রাহ্মণের ব্যর্থতা। তাদের উচিত ছিল তখন আপদ্ধর্ম মেনে সেই বিশেষ পরিস্থিতিতে বর্ণপ্রথাকে ঢিলে/নমনীয় করে শূদ্রদেরকেও সেনাবাহিনীতে ভর্তি করার জন্য রাজাকে আদেশ দেওয়া। তা তারা করেন নি। ঠিক এই সময় আমাদের ব্রাহ্মণরা আরও একটি ব্যাপারে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। দ্বাপর যুগের শেষপাদে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়ে আগত কলিযুগে মানুষের কর্মের জন্য স্পষ্ট পথনির্দেশ করে গেলেও সেই নির্দেশ বুঝতে ব্রাহ্মণরা সার্বিকভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় যে, রাম ও কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন না বলেই কি তাঁদের শিক্ষা ব্রাহ্মণরা ভালভাবে গ্রহণ করেন নি? আমার এই সন্দেহের আরও একটি কারণ হল, আমি নিজে এমন কিছু ব্রাহ্মণকে দেখেছি যাদের স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি গভীর বিতৃষ্ণা। আসল কথায় ফিরে আসি। আমাদের ক্ষত্রিয়দের কাছে যুদ্ধ মানেই ছিল ধর্মযুদ্ধ। অর্থাৎ ধর্ম মেনে ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধ করতেন। যেমন, সূর্যাস্তের পর যুদ্ধ না করা, একের সঙ্গে এক, অশ্বারোহীর সঙ্গে অশ্বারোহী, রথীর সঙ্গে রথীর যুদ্ধ করা। পলায়নপর শত্রুকে আঘাত না করা। গদাযুদ্ধে কোমরের নীচে আঘাত না করা। যুদ্ধের সময় প্রতিপক্ষের প্রজাদের উপর আক্রমণ না করা। প্রজাদের সম্পত্তি নষ্ট না করা—ইত্যাদি বহু নিয়ম মেনে ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধ করতেন। তাই আমাদের দেশে যুদ্ধকে বলা হত ধর্মযুদ্ধ। ধর্মযুদ্ধ কথাটির দু'রকম মানে হয়। এক, ধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ। আর এক, ক্ষাত্রধর্ম মেনে যুদ্ধ। যাইহোক আমাদের ক্ষত্রিয়রা ক্ষাত্রধর্ম মেনে যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু পশ্চিমদিক থেকে যে আক্রমণকারীরা এল, তারা ছিল হায়েনার মত নৃশংস আর শিয়ালের মত ধূর্ত। তাদের সঙ্গে ধর্ম মেনে যুদ্ধ করতে গেলে পরাজয় ও বিনাশ ছিল নিশ্চিত। তাই হয়েছে। ইতিহাসে এর অসংখ্য উদাহরণ। একটি উদাহরণই যথেষ্ট—মহম্মদ ঘোরীকে পৃথ্বিরাজ চৌহান বার বার যুদ্ধে পরাজিত করে ক্ষমা করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। আর ঐ ঘোরী যখনই সুযোগ পেল বিশ্বাসঘাতকতা করে পৃথ্বীরাজকে পরাস্ত করে, তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করে ভারতের হাজার বছরের দাসত্বের সূচনা করে দিল। পৃথ্বীরাজ তাঁর ক্ষাত্রধর্ম মেনে যুদ্ধ করেছিলেন। ভুল করেছিলেন, অন্যায় করেছিলেন। তাঁকে সেই সময় কেউ পরামর্শ দেয়নি যে অধার্মিকের সঙ্গে ধর্মাচরণ করা বিধেয় নয়। বিশেষ করে যেখানে দেশের অখণ্ডতা ও প্রজাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত। এই পরামর্শ দেওয়ার কাজটাই করার কথা ছিল ব্রাহ্মণদের যা তারা করতে পারেন নি। অথচ মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ বার বার পাণ্ডবদের দিয়ে ক্ষাত্রধর্মের নিয়মকানুন লঙ্ঘন করিয়েছেন। দু'টি উদাহরণ যথেষ্ট। এক, রথের চাকা মাটিতে বসে গেলে নিঃশস্ত্র কর্ণকে আঘাত করতে অর্জুনকে আদেশ। দুই, গদাযুদ্ধে দুর্যোধনের কোমরের নীচে আঘাত করতে ভীমকে আদেশ। কর্ণ বধে অর্জুনকে আদেশ দিতে গিয়ে কৃষ্ণ স্পষ্টভাবেই অর্জুন ও কর্ণকে বলেছিলেন—ধর্মকে যে রক্ষা করে বা যে নিজে ধর্মাচরণ করে, কেবলমাত্র সে-ই অন্যের কাছ থেকে ধর্মাচরণ আশা করতে পারে। কৌরব সভায় দ্রৌপদীকে অপমানের সময়, সপ্তরথী দিয়ে অভিমন্যু বধের সময় কর্ণ ধর্মাচরণ করেননি। তাই অর্জুনের কাছ থেকেও তিনি ক্ষাত্রধর্মাচরণ আশা করতে পারেন না। রামচন্দ্রও একই কাজ করেছিলেন, যা বুঝতে অধিকাংশ

শেষাংশ ৪ পাতায়

৩য় পাতার শেষাংশ

ক্ষত্রিয় ও নবক্ষত্রিয়

রামভক্ত অক্ষম। লক্ষ্মণকে পাঠিয়ে যজ্ঞরত অবস্থায় নিঃশস্ত্র ইন্দ্রজিৎকে বধ করিয়েছিলেন। কেন? কারণ ইন্দ্রজিৎ ক্ষাত্রধর্ম অনুসারে সামনে থেকে লড়াই করতেন না। মেঘের আড়াল থেকে লড়াই করতেন। সুতরাং রাম সহজেই স্থির করেছিলেন যে ইন্দ্রজিতের সঙ্গে ক্ষাত্রধর্ম মেনে লড়াই করার প্রয়োজন নেই। রাম ও কৃষ্ণের দেওয়া এই শিক্ষা গ্রহণে পৃথ্বীরাজ চৌহান এবং আমাদের বহু রাজা ও ক্ষত্রিয় বীরেরা ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাই আমাদের এই দুর্দশা। তাদের ক্ষাত্রধর্ম পালনে নিষ্ঠা হয়তো অহংকারে পরিণত হয়েছিল। সাভারকার একেই বলেছেন 'সদ্‌গুণ বিকৃতি', যা আমাদের দেশ ও জাতির সর্বনাশ করেছে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রের নির্দেশ সঠিকভাব গ্রহণ করতে পেরেছিলেন মহামতি চাণক্য। তাঁর বাস্তবজ্ঞানের জন্য গ্রীক আক্রমণের সময় থেকে আমাদের দেশ দু'হাজার বছর স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে পেরেছে।

ক্ষত্রিয় ও রাজাদেরকে সঠিক পথনির্দেশ করতে ব্রাহ্মণরা ব্যর্থ হয়েছিলেন, এর কারণ কী? তাদের কি শাস্ত্রজ্ঞান ও বুদ্ধি দৈন্য হয়েছিল? তা তো হওয়ারও কথা নয়। প্রকৃত ঘটনা হল, ব্রাহ্মণরাই ধর্মচ্যুত হয়েছিলেন। তাঁদের স্খলন হয়েছিল। অবশ্যই সকলের নয়। বহু ব্রাহ্মণ ছিলেন, এখনও আছেন যাঁরা ব্রাহ্মণের সর্বোচ্চ মানকে ধরে রেখেছেন। উদাহরণ বুড়ো রামনাথ, ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি। কিন্তু রাজপুরোহিত-কুলগুরু পদে যাঁরা ছিলেন তাঁরা তাদের দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাই আমাদের দেশ ও জাতির দুর্দশা।

আর একটি খুব দরকারী বিষয় বলে ক্ষত্রিয় প্রসঙ্গ শেষ করব। বিদেশী মুসলিম আক্রমণের ভয়াবহতা মনুষ্য কল্পনার বাইরে। মধ্যযুগে উপলব্ধ বিভিন্ন ইতিহাসের পাতায় (অধিকাংশই মুসলিম ঐতিহাসিকদের লেখা) তার বর্ণনা কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের এই দুর্ভাগা জাতির ছদ্ম স্বাধীনতার (১৯৪৭) পরে ব্রিটিশের থেকেও খারাপ যে শাসকগোষ্ঠী আমাদের উপর চেপে বসেছে তাদের বদমাইসিতে আমাদের সেই সর্বনাশের ইতিহাস মুছে দিয়ে বংশীধারী মুসলিম আক্রমণকারীদের ইতিহাস লেখা হয়েছে ও তাই আমাদেরকে শেখানো হচ্ছে। সেই ভয়াবহ নিষ্ঠুর, ক্রূর, পাশবিক ইসলামিক আক্রমণের ইতিহাস সঠিকভাবে তুলে ধরেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, স্যার যদুনাথ সরকার, ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকর প্রভৃতিরা। বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবী ভারতের উপর মুসলিম আক্রমণকে বিশ্ব ইতিহাসের রক্তাক্ততম অধ্যায় (Bloodiest chapter in history) বলে অভিহিত করেছিলেন একথা বর্তমান শিক্ষিত প্রজন্ম জানে না। বিবেকানন্দ স্পষ্টভাবে বলেছেন—ইসলামিক আক্রমণে হিন্দু জাতির চল্লিশ কোটি মানুষের ক্ষয় হয়েছে। ডঃ আম্বেদকর আরও বিস্তৃতভাবে সেই আক্রমণ, সেই নৃশংসতা, সেই জনক্ষয় ও আক্রমণকারীর ধর্মান্ধতার বর্ণনা দিয়েছেন। এই প্রচণ্ড আক্রমণের অভিঘাতটা প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়র উপরেই পড়েছিল। অন্যদের উপরেও পড়েছিল, একটু কম। সেই ধ্বংসলীলায়, বিশেষতঃ উত্তর ভারতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেল, শাস্ত্র ধ্বংস হয়ে গেল। ধ্বংস হয়ে গেল শিল্প, সাহিত্য, কলা—সবকিছু। ধ্বংস হয়ে গেল বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ। আর গেল যুদ্ধ কলা ও যুদ্ধবিদ্যা। ক্ষত্রিয়র অভাবে দেশ তো পরাধীন হয়েইছে, সমাজ হয়ে পড়ল অরক্ষিত। মঠ, মন্দির, দেবমূর্তি কিছুই অক্ষত থাকল না। দেবমূর্তি ভেঙে মসজিদের সিঁড়ি তৈরি হল। আর সব থেকে বিপন্ন হল আমাদের মাতৃজাতির সম্ভ্রম। আলাউদ্দিন খিলজী (পদ্মিনী)র সময় থেকে সিরাজদৌল্লার সময় পর্যন্ত সেই ধর্মান্ধ নারীলোলুপতার অজস্র ঘটনা আমাদের মনকে আজও কম্পিত করে তোলে। কিন্তু সেই সব ইতিহাস চাপা দিয়ে ইসলামকে এক মধুর প্রেম ও শান্তির ধর্ম হিসাবে তুলে ধরে আমাদের জাতির বর্তমান প্রজন্মের মস্তিষ্ককে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে, যার পরিণাম হবে খুবই খারাপ।

ঐ ভয়াবহ ইসলামিক আক্রমণে যে ক্ষত্রিয়রা বেঁচে গিয়েছিল, তারা মুসলিম শাসকের কাছে নতিস্বীকার করেই বাঁচতে পেরেছিল। মানসিংহ, যশোবন্ত সিংহ প্রভৃতি। তাই এই ক্ষত্রিয়রা তাদের ক্ষাত্রতেজ হারিয়ে মুসলমানের দাসত্ব করেছে। তাদের বংশধররা এই গত কয়েকশ বছরে ক্ষাত্রধর্ম ও স্বধর্মনিষ্ঠা হারিয়ে ফেলেছে। রাজার জাতি দাসের জাতিতে পরিণত হয়েছে। আর দাস মানসিকতার মানুষ সুযোগ পেলেই অত্যাচারী হয়। বর্তমান উত্তর ভারতে, বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে এই ক্ষত্রিয় বংশ, যারা সাধারণতঃ ঠাকুর নামে পরিচিত, তারাই অনগ্রসর জাতির উপর (SC) বেশি অত্যাচার করে। ব্রাহ্মণরা তত নয়। তাই আজ দেশরক্ষা ও সমাজ রক্ষার কাজে নতুন ক্ষত্রিয় শ্রেণীর প্রয়োজন। এই প্রয়োজন আরও অনেকবেশি বেড়ে গিয়েছে বর্তমান ভোট রাজনীতিতে মুসলিম ভোটের দাপটের জন্য। এই দাপট দিয়ে তারা প্রশাসনকে পঙ্গু করে রাখে মুসলিম সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে। তাই গ্রামগঞ্জের হিন্দুসমাজ আরও বেশি অরক্ষিত হয়ে পড়েছে। তাই প্রয়োজন আজ নবক্ষত্রিয়ের। এই শ্রেণীর উদ্ভব হবে সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্ণের মধ্য থেকে। ক্ষত্রিয়র বহু গুণ এদের মধ্যে বিদ্যমান। তার থেকেও বেশি কিছু। এদেরকে দেখেই বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'এক মুঠো ছাতু খেয়ে এরা বিশ্ব জয় করতে পারে।' ফিজি, গায়ানা প্রভৃতি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ রাষ্ট্রগুলিতে এরা তা প্রমাণ করে দিয়েছে। উত্তরভারতের বাল্মীকি (চর্মকার), খটিক প্রভৃতি জাতির লোকেদের শৌর্য-বীর্য ও কষ্টসহিষ্ণুতা—যাদের দেখার চোখ আছে তারা দেখেছে। মহারাষ্ট্রের পন্‌ঢারপুর যাত্রা ও কেরলের শবরীমালা যাত্রা এই শ্রেণীর মানুষের সংকল্প ও কষ্টসহিষ্ণুতার অপূর্ব নিদর্শন। আমাদের বাংলার কথা আমি বহুবার বহু প্রসঙ্গে বলেছি। বাগদী, কাওড়া, ডোম, মাহাতো, সাঁওতাল পৌন্ড্র সদ্‌গোপ, চাঁই-মন্ডল, নমঃশূদ্র, রাজবংশী, কৈবর্ত প্রভৃতি জাতি সাহস ও বীরত্বে ভরপুর। আজ যুগের প্রয়োজন—এই সমস্ত জাতিকে ক্ষত্রিয়ের মর্যাদায় উন্নীত করা, ক্ষত্রিয়ের প্রাপ্য সম্মান দেওয়া।

এটা খুবই প্রয়োজন। কারণ আজ আমাদের রাজা যারা, অর্থাৎ শাসকগোষ্ঠী, তারা সম্পূর্ণ বিদেশী ভাবধারায় পরিচালিত এবং ইসলাম ও খ্রীষ্টানের সেবা করছে। তাই স্বাধীন হয়েও আজও আমাদের সমাজ অরক্ষিত। তাই আজও আমাদের মন্দির হয় ভগ্ন, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও শোভাযাত্রা হয় আক্রান্ত, দেবমূর্তি হয় খণ্ডিত এবং নারীজাতির শীল ও সম্ভ্রম আজও বার বার হয় লুণ্ঠিত। আমাদের শাসকগোষ্ঠী এই অপমান, এই অত্যাচারের হাত থেকে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করবে না। তাই আজ ভারতের সেনাবাহিনী দেশের সীমান্ত রক্ষা করলেও সমাজরক্ষার জন্য চাই নতুন ক্ষত্রিয় সমাজ। সেই ক্ষত্রিয় সমাজ জেগে উঠুক স্বামীজির স্বপ্নকে বাস্তব করে, দরিদ্রে ঝুপড়ি থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। আর বাকি সমাজ তাকে দিক ক্ষত্রিয়র মর্যাদা। ক্ষত্রিয়র স্বীকৃতি। এই হোক এ যুগের নতুন আদর্শ। এর জন্য প্রয়োজনে রচিত হোক নতুন সংহিতা। এই সংহিতা রচনার কাজে এগিয়ে আসুন সমাজের নবব্রাহ্মণেরা, যাদের পৈতে থাকুক বা না থাকুক, যাঁরা জ্ঞানে সমৃদ্ধ, বিশ্ব ইতিহাসে বিদগ্ধ, দেশ ও দেশবাসীর প্রতি ভালবাসায় গভীর এবং ধর্মপথগামী।

ক্রমশঃ...

হিন্দু সংহতির ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের কয়েকটি মুহূর্ত

নদীপথে অবাধ অনুপ্রবেশ ঃ শঙ্কিত কেন্দ্রীয় সরকার

এইভাবেই চলছে বাংলাদেশ থেকে অবাধ অনুপ্রবেশ

অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সীমান্ত এলাকায় চলাচলকারী সমস্ত নৌকাগুলির উপর নজরদারি শুরু করলো বি. এস. এফ। মূলত নদীপথ দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটছে বলে বি.এস.এফ সূত্রে জানানো হচ্ছে। সেই কারণে ভারতের নৌকা হলেও তার আরোহীদের নদীর মধ্যে পরিচয় পত্র যাচাই করা শুরু হয়েছে। বি.এস.এফ-এর একটি সূত্রে জানা গেছে, মাঝনদীতে বাংলাদেশের নৌকা থেকে ভারতের নৌকায় অনুপ্রবেশকারীরা উঠে যাচ্ছে। ভারতের নৌকায় উঠে পড়ায় তারা সন্দেহের তালিকায় থাকছে না। এইভাবে গত ১৫ দিনে কয়েক হাজার অনুপ্রবেশকারী শুধুমাত্র স্বরূপনগর, হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ ও সন্দেশখালির একটি অংশে ঢুকে পড়েছে। গোয়েন্দাদের কাছ থেকে এই রিপোর্ট পাওয়ার পরই বি.এস.এফ নৌকায় নজরদারি শুরু করেছে।

বি এস এফের এক পদস্থ কর্তা বলেন, এর আগে নদীপথ ধরেই দুজন লস্কর জঙ্গি এই রাজ্যে ঢুকে ছিল। তাদের মধ্যে একজনকে টাকি থেকে বি.এস.এফ গ্রেপ্তার করেছিল। কিছুদিন আগে বেঙ্গালুরু বিস্ফোরণের মূল চক্রী বসিরহাট সীমান্ত দিয়ে এই রাজ্যে ঢুকেছিল। সেই কারণে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে নজরদারি বাড়াতে বলা হয়েছে।

ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তে চলাচলকারী সমস্ত নৌকায় জাতীয় পতাকা লাগানো বাধ্যতামূলক, যা থেকে সহজেই কোন্ দেশের নৌকা তা বোঝা যায়। মূলতঃ নদীর অর্ধেক পর্যন্ত নৌকাগুলি যাতায়াত করতে পারে। এতদিন সীমান্ত এলাকায় নদীপথে চলাচলকারীদের কোনও পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখতে হত না। কিন্তু সাম্প্রতিক পরিস্থিতির জন্য সচিত্র পরিচয়পত্র রাখা কার্যত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

বি.এস.এফ সূত্রে জানা গিয়েছে, টাকি শহরের উল্টো দিকে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলা। মাঝখানে ইছামতী নদী বয়ে গিয়েছে। আবার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের উল্টোদিকে বাংলাদেশ। সেখানেও দু-দেশের সীমানা ভাগ করেছে বাংলাদেশ। সীমান্ত এলাকায় সন্ধ্যার নৌকা চলাচল করতে দেওয়া হয় না। গোয়েন্দাদের নজরে এসেছে কিছু দালাল নতুন কায়দায় এদেশে লোক ঢোকাতে শুরু করেছে। কিছু এলাকা কার্যত অরক্ষিত আছে। ওই এলাকায় অনুপ্রবেশকারীরা বাংলাদেশের নৌকায় মাঝনদী পর্যন্ত আসছে, তারপর ভারতের নৌকায় উঠে পড়ছে। এইভাবে এক নতুন পন্থায় অনুপ্রবেশকারীরা ভারতে ঢোকার চক্রান্ত চালাচ্ছে।

স্থানীয় লোকের কথায়, সীমান্ত এলাকার লোকজন সাধারণত সবসময় পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখে। সেখানে সন্ধ্যার পর অচেনা লোক দেখলেই বি.এস.এফ আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে পরিচয়পত্র রাখা একপ্রকার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বি.এস.এফের এক অফিসার বলেন, কাউকে হেনস্থা করা আমাদের লক্ষ্য নয়। আসল ভারতীয় আড়ালে অনুপ্রবেশ এদেশে ঢুকে পড়ছে কিনা তা দেখাই আমাদের লক্ষ্য।

আবার দেবীমূর্তি ভাঙা হল বাংলাদেশে

বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত। সেদেশে সংখ্যাগুরুদের এই শান্তির বাণী সংখ্যালঘু হিন্দুদের প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুলেছে। জীবন, সম্পত্তি, নারীর সম্মানের সাথে সাথে হিন্দুর ধর্মবিশ্বাস কোন কিছুই সেখানে সুরক্ষিত নয়। গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী বাথানিয়া চালা এলাকায় একটি হিন্দু মন্দিরে হামলা চালিয়ে সমস্ত মূর্তি ভেঙে ফেলে মৌলবাদীরা। সাথে সাথে একটি চিঠির মাধ্যমে হিন্দুদের হুমকি দেওয়া হয়েছে যে মূর্তি পুজো বন্ধ করতে হবে, অন্যথায় মন্দিরে বোমা মারা হবে। হিন্দুদের দেশত্যাগ করার হুমকিও ওই চিঠির মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে।

গোয়েন্দা রিপোর্টে উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য

পশ্চিমবঙ্গে হামলার ছক কষছে জামাত-ই-ইসলাম

বাংলাদেশের জামাত-ই-ইসলামি এবং ছাত্র শিবিরের কর্মীদের মদত দেওয়ার কারণে পশ্চিমবঙ্গের অনেক রাজনৈতিক নেতার উপর নজর রাখা হচ্ছে—এই মর্মে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে একটি নোট পাঠানো হয়েছে আই.বি-র পক্ষ থেকে।

সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আর.পি.এন. সিংকে পাঠানো একটি নোটে আই.বি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে বিপুল অস্ত্রভাণ্ডার ভারতে আনার চক্রান্ত চলছে এবং আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, খুব তাড়াতাড়ি এই অস্ত্রশস্ত্র পশ্চিমবঙ্গে এসে পৌঁছাবে।

এই খবরটি আরও গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, তৃণমূল কংগ্রেসের অনেক নেতার উপর জামাত-ই-ইসলামি এবং ছাত্র শিবিরের কর্মীদের আশ্রয় ও মদত দেওয়ার অভিযোগ উঠছে।

আই.বি. অফিসারদের বক্তব্য, বাংলাদেশ থেকে তাড়া খাওয়া এইসব সন্ত্রাসবাদীরা পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিচ্ছে। এদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে রাজ্যের কয়েকজন রাজনৈতিক নেতার উপর নজরদারী করা হচ্ছে। সম্প্রতি রাজ্যসভায় নির্বাচিত একজন প্রতিনিধি সহ আরও কয়েকজন নেতার নাম এ ব্যাপারে উঠে এসেছে। আই.বি-র বক্তব্য— কয়েকজন এম.পি, যাদের সিমি-র সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল, তারা এই সমস্ত সন্ত্রাসবাদীদের সুরক্ষা দিচ্ছেন। আই.বি সূত্র অনুসারে ৪০ জন সন্ত্রাসবাদী পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে। বিহারের ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনদের মত বাংলায় জামাত এবং সিমি-র সন্ত্রাসবাদীদের খুঁজে পাওয়া খুব সমস্যা হয়ে পড়ছে কারণ এদের পিছনে স্থানীয় লোকেদের পূর্ণ সমর্থন আছে। এরা রাজ্যে ঢুকেই গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে পড়ছে। স্থানীয় পুলিশ উপরের চাপে মুখ খুলতে পারছে না।

তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ধর্মীয় মৌলবাদ নিয়ে রাজনীতি করার অভিযোগ অনেকবারই উঠেছে। বামনেতা বিমান বসুও বাংলাদেশ থেকে তাড়া খাওয়া সন্ত্রাসবাদীদের আড়াল করার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে এনেছেন। বিমান বাবু বলেছেন, ''বাংলাদেশ পুলিশ যখন সাতক্ষীরায় অপারেশন চালায় তখন সন্ত্রাসবাদীরা ভারতে পালিয়ে আসে এবং বসিরহাটের তৃণমূল এম.পি. তাদের আশ্রয় দেন।'' তিনি রাজ্যসভায় সদ্য নির্বাচিত আহমেদ হাসানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, বাংলাদেশের জামাতের সাথে হাসানসাহেবের ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে এবং তিনি জামাতের মুখপত্র 'নয়া দিগন্তের' প্রতিনিধি হিসাবে কাজও করেছেন। বিমানবাবু মনে করেন যে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সেখ হাসিনা যে পদক্ষেপ নিয়েছেন তার বিরুদ্ধেই এই চক্রান্ত হচ্ছে।

বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের সদস্য সেখ ফজলুর করিম সেলিম কিছুদিন আগে এই একই অভিযোগ করেন। ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী সন্ত্রাসবাদীদের গ্রেপ্তার করে বাংলাদেশ সরকারের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য তিনি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধ করেন।

গোয়েন্দা সংস্থাগুলির মতে পরিস্থিতি খুব খারাপের দিকে যাচ্ছে এবং এই বাংলাদেশী সন্ত্রাসবাদীদের যে বা যারা মদত দিচ্ছে তাদের নজরদারীর আওতায় আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশ থেকে ভারতে ঢোকার সহজতম পথ হল পশ্চিমবাংলা এবং সেই কারণেই সিমি-র লক্ষ্য এই পথে অস্ত্রশস্ত্র ভারতে এনে এদেশে সন্ত্রাস চালানো। (সূত্রঃ রেডিফ নিউজ)

এক হিন্দুর বেইমানিতে নাইকুলি গ্রামে অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি

হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত নাইকুলি গ্রামে এক বেইমান হিন্দুর জন্য এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হতে চলেছে। শশাঙ্ক শেখর মল্লিক (মানু) নামক এক ব্যক্তি সমস্ত এলাকাবাসীকে গোপন করে নিজ জমি এক মুসলমানের কাছে বিক্রি করে দেয়।

নাইকুলি গ্রামে শ্রীশ্রী হনুমানজীর মন্দিরের বিপরীতে সরকারি গার্ডওয়ালের ঠিক পাশেই সরকার স্বীকৃত জলাজমির কাছে অনুমতি ছাড়াই নির্মাণ কাজ চলায় খোঁজ নিতে গিয়ে এলাকাবাসী জানতে পারে, উক্ত স্থানের অংশীদারি মালিক শশাঙ্ক মল্লিক পাশের গ্রামের তনু মোল্লা ও ন্যাড়া মোল্লাকে বিক্রির জন্য অগ্রিম নিয়ে প্রাথমিক কাগজপত্র তৈরি করেছে। তৎক্ষণাৎ গ্রামের বিশিষ্ট লোকজন শশাঙ্ক মল্লিক ও তার ছেলে তুহিনকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে। তারা জানায় জমি বিক্রির খবর সম্পূর্ণ মিথ্যা। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, উক্ত জায়গায় মুসলমানরা কোনরকম অনুমতির তোয়াক্কা না করে গায়ের জোরে বাড়ি তৈরি শুরু করেছে। সমস্ত গ্রামবাসীরা তাকে অনেকভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে যে এর ফলে ভবিষ্যতে অবাঞ্ছিত ঝামেলা হতে পারে। ওদেরকে টাকা ফেরত দিতে বা অন্যত্র জায়গা দিতে অনুরোধ জানানো হয়। শশাঙ্কবাবুর জায়গাটাও এলাকার লোকেরা কিনে নেবে বলেও জানায়। কিন্তু শশাঙ্ক মল্লিক ও তার ছেলে তুহিন রাজি না হয়ে মিটিং ছেড়ে চলে যায়। গ্রামবাসীরা এখনও হাল না ছেড়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রতিবন্ধী যুবতীকে গণধর্ষণ

দুষ্কৃতিদের বাঁচাতে আসরে শাসকদলের নেতা

রাতের অন্ধকারে তুলে নিয়ে গিয়ে এক শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী যুবতীকে গণধর্ষণ করে বাড়ির ছাদ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল দুষ্কৃতিরা। এতবড় ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য এবং দোষীদের যাতে শাস্তি না হয়, তারজন্য ডানকুনি পুরসভার আফডাঙা এলাকার তৃণমূল নেতা অতি সক্রিয় হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ। আক্রান্ত মেয়েটির পরিবারকে শাসানো হচ্ছে।

আফডাঙা এলাকার বছর ২৩-এর শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী মেয়েটির পরিবারের সঙ্গে একটি জমি নিয়ে প্রতিবেশীদের কয়েক বছর ধরেই টানাপোড়েন চলছে, মামলাও হয়েছে। নির্যাতিতার বাবার অভিযোগ, পরিবারের প্রতি আক্রোশ মেটানোর জন্যই গণধর্ষণের শিকার হয়েছে তাঁর মেয়ে। গত ৪ঠা ফেব্রুঃ রাত ৮টা নাগাদ ওই প্রতিবন্ধী যুবতী বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়েছিল। সেই সুযোগে স্থানীয় চার যুবক শেখ কামাল, শেখ মুকারিম, শেখ নাসিরুদ্দিন এবং শেখ বাপি মল্লিক তাকে জোর করে একটি ফাঁকা বাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। সেখানেই তাকে আটকে রেখে গণধর্ষণ করা হয়। যৌন নির্যাতন চালিয়ে ওই প্রতিবন্ধীকে বাড়ির ছাদ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে খুনের চেষ্টা করা হয়।

সাঁওতাল সমাজকে কালিমালিপ্ত করার জঘন্য ষড়যন্ত্র

বীরভূমের লাভপুর থানার একটি ছোট গ্রাম সুবলপুর। সাঁওতাল অধ্যুষিত অখ্যাত এই গ্রামটি আজ বহুচর্চিত। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সারা ভারত তথা পৃথিবীর সমস্ত প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রথম পাতার গরম খবর এই সুবলপুর। না, এই গ্রামে মাটি খুঁড়ে সোনা পাওয়া যায় নি। তাহলে কী এমন ঘটল সেখানে? সেখানে হয়েছে গণধর্ষণ। পশ্চিমবঙ্গে এখন গণধর্ষণ কি কোন খবর? এ রাজ্যে পরিবর্তনের হাওয়ায় সর্বাধিক পরিপুষ্ট ফসলগুলির মধ্যে এই ধর্ষণের সংস্কৃতি অন্যতম। কামদুনী থেকে পার্ক স্ট্রিট, খিদিরপুর থেকে মধ্যমগ্রাম---খবরের কাগজের প্রথম পাতা জমজমাট এই ধর্ষণের সংবাদে। টিভি তে যে কোন নিউজ চ্যানেল খুললেই একটা না একটা ধর্ষণের খবর অবধারিত। না, ব্যাপারটা বড়ই একঘেয়ে হয়ে গেছে—পাঠক ও শ্রোতাদের কাছে তো বটেই, সাংবাদিকদের কাছেও। নতুন মশলা না পড়লে ঠিক জমছিল না। এই বহু কাঙ্খিত চটকদার মশলার আমদানি হলো সুবলপুরে। অখ্যাত এই গ্রাম রাতারাতি কুখ্যাত হয়ে উঠল বিশ্বব্যাপী। বড় বড় ছাতা লাগানো মিডিয়ার গাড়িতে ভর্তি হয়ে গেল মোরাম বিছানো সরু রাস্তা। দলে দলে সাহেব সাংবাদিক (সঙ্গে দেশীরা তো আছেনই) ভাঙা এবং কাঁচা রাস্তা পাড়ি দিয়ে পৌঁছে গেল এই গ্রামে। কী এই মশলা? সেটা হলো---সাঁওতাল সমাজের পরম্পরাগত বিচার ব্যবস্থা 'সালিশী সভায়' এক যুবতীর জন্য শাস্তি নির্ধারিত হলো গণধর্ষণ। গ্রামের

সুবলপুরের গ্রামবাসীদের সাথে সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ

মোড়লের নির্দেশে গণধর্ষণ। অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক ঘটনা। অবশ্য এমনটা যদি বাস্তবে ঘটে থাকে। হ্যাঁ ঠিক পড়ছেন—এমনটা যদি বাস্তবে ঘটে থাকে। হঠাৎ এই 'যদি'র অবতারণা কেন? সঙ্গত কারণ আছে। ঘটনার পরে এলাকার মানুষের প্রতিক্রিয়া সেই দিকেই ইঙ্গিত করছে। বোলপুর থেকে জেলাসদর সিউড়ি পর্যন্ত আদিবাসী বহির্ভূত মানুষের মনেও এই গণধর্ষণের বাস্তবতা নিয়ে সন্দেহ আছে। কিছু প্রশ্ন মুখে মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেগুলো অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

কামদুনী থেকে মধ্যমগ্রাম—সর্বত্র মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল ধর্ষণকারীদের গ্রেপ্তার এবং শাস্তির দাবীতে। এক্ষেত্রে চিত্রটা সম্পূর্ণ বিপরীত। ২২শে জানুয়ারী সন্ধ্যায় চারজন অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রাম থেকে থানায় নিয়ে গেলে তিনটে ট্রাক্টর ভর্তি মানুষ তাদেরকে ছাড়িয়ে আনার জন্য থানায় হাজির হয়। অভিযুক্তরা এবং অভিযোগকারিণী উভয়েই একই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তাহলে ধর্ষকদের প্রতি মানুষ এত সহানুভূতিশীল কেন? তাদের বক্তব্য, সম্পূর্ণ ঘটনাটাই সাজানো। সেখানে আদৌ ধর্ষণ হয়নি। বরং গ্রামবাসীদের ক্ষোভ অভিযোগকারিণী কিশোরী (নাম পরিবর্তিত) মুর্মুর প্রতি—দিল্লী থেকে ফিরে আসার পর গ্রামে, নিজের বাড়িতেই দেহব্যবসা চালাচ্ছিল মেয়েটি। খালেক শেখ এবং তার সঙ্গীরা ছাড়াও এলাকার অনেক পুরুষের আনাগোনা ছিল সেই বাড়িতে। বার বার সতর্ক করা সত্ত্বেও মেয়েটি কারো কথা কানে নেয়নি। গ্রামে কিশোর-যুবকদের অধঃপতনের হাত থেকে বাঁচাতে এটা বন্ধ হওয়া জরুরী ছিল। ২০ তারিখ সন্ধ্যাবেলায় শেখ খালেকের সাথে আপত্তিজনক অবস্থায় হাতেনাতে ধরা পড়তে ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা মেয়েটিকে খালেকের সাথে একটি গাছে বেঁধে রাখে। পরেরদিন সকালে বিচার শুরু হয়। এই বিচার সভায় এলাকার প্রচুর মানুষ উপস্থিত ছিলেন। চৌহাট্টা-১ এর তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য অজয় মন্ডলসহ খালেকের দাদা সেখ ফারুক এবং তার অনেক বন্ধুবান্ধব উপস্থিত ছিল এই সভায়। সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ২৫,০০০ টাকা জরিমানা দিয়ে খালেককে মুক্ত করে নিয়ে যায় তার দাদা ফারুক। একই সঙ্গে মেয়েটিকেও মুক্তি দেওয়া হয়। বিচার হলো ২১শে জানুয়ারী সকালে, আর সেই বিচারে মাঝি হারামের নির্দেশে মেয়েটিকে গণধর্ষণ করা হলো ২০শে জানুয়ারী, অর্থাৎ আগের দিন রাতে। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

বিচার সভায় দুইপক্ষের অনেক মানুষ উপস্থিত ছিল, ছিলেন পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধি। প্রশ্ন উঠছে, ওই সভায় মেয়েটি কিংবা খালেক সেখ কেন এই গণধর্ষণের অভিযোগ করলো না। আগের রাতে ১৩ জন মানুষ দ্বারা ধর্ষিত কিশোরী মুর্মু (নাম পরিবর্তিত) সুস্থ অবস্থায় কিভাবে ওই সভায় অংশগ্রহণ করলো, কেনই বা সে সঙ্গে সঙ্গে থানায় না গিয়ে ২২ তারিখ বিকালে থানায় অভিযোগ করতে গেল? তাও নিজে বাই-সাইকেল চালিয়ে। ঘটনার পর দু'দিন সম্পূর্ণ সুস্থ থাকা মেয়েটি থানায় অভিযোগ জানানোর পর হঠাৎ কেন এতটা অসুস্থ হয়ে পড়ল যে তাকে সিউড়ি হাসপাতালে ভর্তি করতে হলো? অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের সময় থানায় স্থানীয় বিধায়ক মনিরুল ইসলামের উপস্থিতি—এই সমস্ত ঘটনাক্রম কোনও ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত নয় তো? এই সমস্ত প্রশ্নও এখন মানুষের মুখে মুখে ঘুরছে। অনেক কিছু সম্ভব। মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই কেসটিতে হস্তক্ষেপ করায় আশা করা যায় যে বিচার প্রক্রিয়া সঠিক পথে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হবে। সত্য উদ্‌ঘাটিত হওয়া পর্যন্ত সকলের অপেক্ষা করাই বাঞ্ছনীয়।

ষড়যন্ত্রের অভিযোগ সাঁওতাল সমাজের মধ্য থেকেও প্রবলভাবে উঠছে, এবং এই ষড়যন্ত্রের শিকড় অত্যন্ত গভীর। একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা, সত্য বা মিথ্যা যাই হোক না কেন, তার জন্য সমগ্র সাঁওতাল সমাজ-ব্যবস্থা, সভ্যতা, সংস্কৃতিকে

আদিবাসীদের ধিক্কার সমাবেশ

যেভাবে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে, যেভাবে তাদের সালিশী সভাকে 'খাপ পঞ্চায়েত', 'মধ্যযুগীয় বর্বর ব্যবস্থা', 'তালিবানি ব্যবস্থা'—ইত্যাদি বিশেষণে আখ্যায়িত করা হয়েছে, তার কোন যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া মুশকিল। পৃথিবীর যে কোন দেশের সংবিধান স্বীকৃত বিচার ব্যবস্থায় বিচারকের অনিচ্ছাকৃত এবং ইচ্ছাকৃত ভুলের জন্য কি সেই বিচার ব্যবস্থা তথা সমগ্র জাতিকে দায়ী করা হয়? উচ্চপদে আসীন কোনও একজন ব্যক্তির অপরাধের জন্য সমগ্র জাতিকে সেই অপরাধে অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়? তাহলে একজন মাঝি মোড়লের অপরাধে (প্রমাণিত নয়), সমগ্র সাঁওতাল জাতিকে বিশ্ববাসীর সামনে এভাবে অপমান করার পিছনে কি অন্য কোন কারণ বিদ্যমান?

বীরভূম জেলার সাঁওতালদের 'মাটি' এবং 'বেটি'র উপর খালেক-ফারুকদের নেক-নজর সর্বজনবিদিত। রামপুরহাট মহকুমার পাথরখাদান অঞ্চলে এই বিষয় নিয়ে অনেক লড়াই হয়েছে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে। সাঁওতালদের আভ্যন্তরীণ এই সমস্ত কঠোর ব্যবস্থাগুলির কারণে প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয় এই খালেক-ফারুকদের। বিশেষতঃ সংখ্যালঘু হিসাবে দেশের সংবিধান এবং আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যা খুশি তা করার অশ্বমেধের ঘোড়া সেখানে গিয়ে মুখ থুবড়ে পরে যায় বার বার। কোনো পেটোয়া রাজনৈতিক নেতার জারিজুরি চলে না সেখানে। এক্ষেত্রেও ২৫,০০০ টাকা জরিমানা করা এবং সারা রাত গাছে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল খালেক কে। ভারতে এই ধরণের অপমান কি সংখ্যালঘুদের সহ্য হয়?

এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই সম্ভবতঃ কথিত ঘটনার পরের দুই দিন ষড়যন্ত্রের ছক তৈরি করা হয়। প্রশ্ন হলো সাধারণ ধর্ষণের অভিযোগের পরিবর্তে মাঝি হারামের নির্দেশে ধর্ষণের অভিযোগ কেন করা হল? কারণ সামান্য প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার সাথে সাথে আরও বড় একটা উদ্দেশ্য পরিপূরণের সুবর্ণ সুযোগ এসে যায় ষড়যন্ত্রকারীদের সামনে। সেটা হলো এই আন্তর্জাতিক চাপকে কাজে লাগিয়ে সাঁওতালদের পরম্পরাগত বিচার ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেওয়া। একবার এই ব্যবস্থাকে যদি শেষ করে দেওয়া যায় তাহলে শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর এই সাঁওতালদের বিচার চাওয়ার আর কোন জায়গা থাকবে না। প্রথম তারা ধাক্কা খাবে থানায়। কারণ পুলিশে একটি সর্বজনবিদিত সাধারণ নীতি হলো অভিযোগ না নেওয়া। থানায় অভিযোগ না নিলে একজন সাধারণ, গরিব, খেটে খাওয়া আদিবাসীর কাছে কি সময় থাকবে পেটে গামছা বেঁধে অভিযোগ জানানোর জন্য দ্বারে দ্বারে ঘোরার? যদি কেস আদালত পর্যন্ত পৌঁছায়, তাহলেও তারিখের পর তারিখ হাজিরা দেওয়া এবং প্রত্যেক তারিখে পকেট খসিয়ে উকিলকে টাকা দেওয়া ক'জনের পক্ষে সম্ভব হবে? তাহলে সারমর্ম কী দাঁড়ালো? আদিবাসী সাঁওতালদের মাটি দখল হবে, তাদের মেয়েদের যথেচ্ছভাবে ভোগ করা হবে কিন্তু এই অন্যায়ের কোন বিচার হবে না। এই সমূহ বিপদের আশঙ্কায় সাঁওতাল সমাজ সংগঠিত হয়েছে। ভারত জামাত মাঝি মাডোয়া নামক একটি আদিবাসী সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে বেশ সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গত ২রা ফেব্রুয়ারী আমদপুরে একটি প্রতিবাদ সভাও হয়েছে, যেখানে তাদের ক্ষোভ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

এই পরিস্থিতিতে একমাত্র হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ ছাড়া কেউ খোলাখুলি আদিবাসীদের পাশে দাঁড়ানোর সাহস দেখায় নি। শ্রী ঘোষ নিজে সেখানে উপস্থিত হয়ে গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলেন, তাদের কম্বল, চাল, কিছু সবজি ইত্যাদি সামগ্রী দিয়ে সহযোগিতা করেন। তাঁর মতে অপরাধের বিচার আদালত করবে কিন্তু এই ঘটনার ফলে সমগ্র সাঁওতাল সমাজ যে বিপদের সম্মুখীন হতে চলেছে, তার পরিণাম ভয়ঙ্কর। সম্পূর্ণ পশ্চিমবাংলাকে নিয়ে বৃহত্তর বাংলাদেশ গঠনের চক্রান্তের অঙ্গ হিসাবে বাংলার শক্তিশালী আদিবাসী সমাজকে দুর্বল করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এই চক্রান্তকে রুখে দেওয়ার লড়াইয়ে হিন্দু সংহতি সমস্ত শক্তি দিয়ে আদিবাসী সমাজকে সাহায্য করবে।

আসামের দরং জেলায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ

আসামের দরং জেলার কলাইগাঁও থানার উদমারি গ্রামে গরু চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সংবাদ পাওয়া গেছে। এলাকায় লাগাতার গরু চুরির ঘটনায় জেরবার গ্রামবাসীরা রাতে পাহারা দেওয়ার সময় একটি সন্দেহজনক ভ্যান গাড়ি আটকায়। জিজ্ঞাসাবাদে সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়ায় গরু চোর সন্দেহে তারা ভ্যানের আরোহীদের উপর চড়াও হয়। উক্ত ভ্যানটিতে শ্যামটিলা গ্রামের বাসিন্দা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষেরা ছিলেন। গ্রামবাসীদের মারে ১৩ জন ভ্যান আরোহী গুরুতর জখম হয়। তাদেরকে গৌহাটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষের ফলস্বরূপ এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.org>, <www.hindusamhatitv.blogspot.in>, <www.hindusamhatibangla.com>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Bikarna Naskar, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012